বিশ্ব নারী দিবস, যুক্তিবাদ ও ধর্ম।

বিশ্ব নারী দিবস চলে গেল। বেশ কয়েকটি ওয়েব সাইট ঘটা করে দিবসটি পালন করেছে। মুক্তমনা ওয়েব সাইট দিনটি যুক্তিবাদী দিন হিসাবে পালন করেছে। ইন্টারনেটের বহু লেখক যুক্তিবাদ ও নারী স্বাধীনতার উপর অনেকগুলি লেখা প্রকাশ করেছেন। আমার প্রশ্ন, পিতৃতান্ত্রিক এক কেন্দ্রিক পুজিবাদী সমাজে নারী স্বাধীনতা কি সম্ভব?

প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রন নারী থেকে নরের হাতে স্থানান্তরের ফলে সমাজ মাতৃতান্ত্রিক থেকে পিতৃতান্ত্রিকে রূপান্তর ঘটে। অর্থনৈতিক কারনে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে দাস সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভাব ঘটে। দাস এবং প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারী ছিল যথাক্রমে যৌন দাসী এবং হিন্দু মন্দিরের সেবাদাসী বা বৌদ্ধদের আম্রপালী। খৃষ্টান যাজকতন্ত্র আমলে নারী যাজকদের যৌন ক্ষুধা মিটিয়েছে সন্যাসিনী হিসাবে। সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থায় নারীর স্থান ছিল রাজা বাদশাহদের হেরেমে। ভারতের মুসলিম সুলতান ও মোঘল সম্রাটরা নারীকে ভালবেসে মন্দির থেকে নিজ হেরেমে নিয়ে আসেন। বৃটিশ আমলে হিন্দু-মুসলিম জমিদারদের কল্যানে নারী বাইজীতে রূপান্তরিত হয়। দেহ প্রদর্শনের মাধ্যমে নরকে আকৃষ্ট করার জন্য আধুনিক পুজিবাদী সমাজে নারীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ক্লাবে ও পণ্য বিক্রির এ্যাডে। নারী বর্তমানে যৌন কর্মী। দেখা যাচ্ছে যে সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমাজে নারী বিভিন্ন ভাবে ভোগের পণ্য হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। সামাজিক উৎপাদন নিয়ন্ত্রনের উপর অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো নির্ভরশীল। বিদ্যমান কাঠামোর সুবিধা ভোগী অংশ স্থিতি অবস্থা বজায় রাখার জন্য প্রাচীন কালে প্রবর্তীত ধর্ম আমদানী করতঃ সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে। দেখা যাচ্ছে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো নারীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রনকারী, কিন্তু আমাদের কোন কোন বন্ধু বর্ণিত কাঠামোর পরিবর্তে তার নিয়ন্ত্রনাধীন ধর্মকে নারীর নিয়ন্ত্রনকারী মনে করেন।

ইসলাম বিদ্বেষী কোন কোন মুক্তমনের দাবীদারেরা ইসলাম ব্যাশিং কালে মার্ক্সের উদ্বতি দিয়ে বলতেন "ধর্ম হলো ওপিয়াম"। ধণতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে ঐ একই পুস্তকে মার্ক্সের মন্তব্য ছিল "নারী বুর্জিয়ার শয্যাসঙ্গিনী এবং সন্তান উৎপাদনকারী যন্ত্র"। আমার প্রশ্ন, উক্ত ব্যক্তিরা মার্ক্সের এই মন্তব্যের সাথে একমত পোষন করেন কিনা?

ব্যাশিং করে ধর্মের নেশা যেমন দূর করা সম্ভব নয়, তেমনি নিজেকে যুক্তিবাদী (Rationalist) হিসাবে জাহির করে নারী দিবস পালন করে নারী মুক্তি সম্ভব নয়। নারী মুক্তির পূর্ব শর্ত হলো সমাজের নিম্ন স্তরে অবস্থান কারী সংখ্যা গরিষ্ঠ নারীর অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়া। এর জন্য প্রয়োজন অনুকূল সমাজিক পরিবেশ। আবার অনুকুল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু প্রগতিশীল রাজনীতি। বর্ণিত রাজনীতির জন্য প্রয়োজন বিদেশী প্রভাব ও সাম্রাজ্যবাদী প্রপাগান্ডা মুক্ত এবং সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি সহনশীল ধর্ম নিরপেক্ষ একদল শিক্ষিত মধ্যবিত্ব শ্রেনীর মানুষ, যারা সকল প্রপঞ্চ বা ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে না দেখে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ভাবে বিশ্লেষণ এবং সব ঘটনার মধ্যে ভারতের ষড়যন্ত্রের সন্ধান পরিহার করবেন। বাংলাদেশের অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ ধর্ম প্রান, কিন্তু ধর্মান্ধ বা মৌলবাদী নয়, যার প্রমান

বিগত তিনটি নির্বচান। উক্ত নির্বাচনগুলির ভোট পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৯৯১ সালে প্রাপ্ত ভোটের প্রায় ১০% ছিল মৌলবাদের অনুকুলে, যা হ্রাস পেয়ে ২০০১ সালে এসে দাড়ায় ৪% তে।

বাংলাদেশের শিক্ষিত লুম্পেন মধ্যবিত্ত্ব শ্রেনী বিগত ৩০ বছরে সৃষ্টি করেছে এক লুম্পেন ধনিক শ্রেনীর, যারা ক্ষমতা লোভী, ভোগবাদী ও বিনিয়োগ নিরুৎসাহী, কিন্তু পন্য আমদানী ও রপ্তনীতে কমিশন খেতে উৎসাহী । ফলশ্রুতিতে ফেলে আসা ভাঙ্গা সুটিকেস ও ছিড়া গেঞ্জী থেকে যাদুমন্ত্রের মত টাকা বের হচ্ছে এবং I will make politics difficult for politicians লুম্পেন নেতার এই মন্তব্যটি যথাযথ ভাবে পালিত হয়েছে। ফলে রাজনীতি থেকে সত্যিকার রাজনীতিবিদ অপসারিত হয়ে লুম্পেন রাজনীতিবিদ স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। তাই সমাজ উন্নয়নের চেয়ে নিজ ভাগ্য উন্নয়নের জোয়াড় সৃষ্টি হয়েছে। ধনী গরীব বৈষম্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে সমাজের অস্থিরতা বাড়ছে।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দৃষ্টি মৃত দ্বিজাতি তত্ত্বে প্রবাহিত করে লুম্পেন পুজির শোষণ নিঃকণ্ঠক করার লক্ষ্যে মৌলবাদী সালসা আমদানী করতঃ সমাজে প্রয়োগের চেষ্টা চলছে। সপ্তম শতাব্দির মৌলবাদী সালসা প্রয়োগ বা জাতিয়তাবাদী মুক্তি সংগ্রামকে মৌলবাদী সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে একাবিংশ শতাব্দির সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ঢেকে রাখা যায় না। ধনী গরীব যে আল্লাহ সৃষ্টি করে না, তা অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ তার অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝে ফেলেছে। কিন্তু বুঝতে পারেন নাই বিভ্রান্তির রংগিন চশমা পরিহিত শিক্ষিত কয়েকজন ভদ্রলোক। পুতুল নাচের মত পর্দার আড়ালে বসে ধর্মীয় মৌলবাদকে কোন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় শক্তি নাচাচ্ছে, তা ভদ্রলোকদের দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় শাসক গোষ্ঠির ছত্রছায়ায় নৃত্যরত মৌলবাদকে দেখে তারা ধর্মকে দায়ী করে চলছেন।

যুক্তিবাদী জনাব জাহেদ আহমেদ তার অভিজ্ঞতা দিয়ে American National Academy of Science এর অভিমত জেনে বুঝে গেছেন যে, প্রকৃতি বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়বস্তু আল্লাহর অস্থিত্ব সন্ধান করা নয়। বস্তুর অন্তঃপ্রকৃতি দ্বন্দ্ব, গুণাগুণ, গতিপ্রকৃতি ও পরস্পরের ক্রিয়া প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিশ্লেষণ প্রকৃত বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়বস্তু। উক্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হাতিয়ারের সাধারণ নাম দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। বস্তুবাদী মানুষ প্রপঞ্চ বা ঘটনা বিশ্লেষণ করে সময়ের প্রেক্ষাপটে। বর্তমানের সংঘঠিত ঘটনা তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল, অতীতের ঘটনা ধর্মের উপর নয়। বর্তমান কালের সুযোগ সন্ধানীরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করছে। আশা করি জনাব জাহিদ ফ্যানাটিক না হলে অচিরেই এ বিষয় অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

আল্লাহর অস্থিত্বের সন্ধান করে ভাববাদী দর্শন। আর এই ভাববাদ দর্শনই হলো মানুষের আদি জ্ঞান, যার বহির্প্রকাশ গ্রীক ও হিন্দু শাস্ত্রে বিদ্যমান। ভাববাদী দর্শনের বিবর্তনে একেশ্বরবাদের আবির্ভাব ও সৃষ্টি তত্ত্বের উদ্ভাব। বস্তু সংক্রান্ত মানব জ্ঞান আগমনের পূর্বশর্ত ছিল যুক্তিবাদ। সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ফলে রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস ও দর্শন, যা বস্তু অর্থ্যাৎ মানব কার্য্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বিধায় উক্ত বিষয় সমূহ বিশ্লেষণে প্রকৃতি বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বলে আলোচ্য বিষয়গুলি বিজ্ঞানের অর্ন্তভূক্ত, যা সমাজ-বিজ্ঞান নামে পরিচিত। প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থ্যাৎ উভয় বিজ্ঞানের সামগ্রিক সাধারন বিশ্লেষণ পদ্ধতির নাম দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, যা যুক্তিবাদের স্থলাভিষিক্ত। যদিও উভয় বিজ্ঞানের অন্তর্গত প্রত্যেকটির শাখার নিজস্ব বিশ্লেষণ পদ্ধতি বিদ্যমান।

সামাজিক কাঠামো উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে সামাজিক প্রপঞ্চ বা ঘটনা সৃষ্টির কারণ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ। ধর্ম এই স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ধর্ম উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কহীন সামাজিক কাঠামোর একটি উপদান। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত হলো মানুষ। সংখ্যা গরিষ্ট মানুষ উৎপাদন করে আর কিছু লোক তা নিয়ন্ত্রন ও ভোগ করে। উৎপাদন নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় যন্ত্র বা কাঠামো। পিরামিট আকৃতির রাষ্ট্রীয় কাঠামোর শীর্ষে বা বিভিন্ন স্থরে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর কাঠামোর চরিত্র বা গুণাগুণ নির্ভর করে না। গঠন প্রকৃতির উপর কাঠামোর চরিত্র নির্ভর করে, যা আবার সামাজিক উৎপাদন ধরনের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদন ধরণের পরিবর্তনের সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন হয়ে থাকে, যা মিসর ও গ্রীক দাস সমাজ, ইউরোপের যাজক, এশিয়া ও ইউরোপের সামন্তবাদ ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামো এবং পরবর্তীতে উপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামো এবং বর্তমান ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুজিবাদী রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণে জানতে পারি।

দাস সমাজ ব্যবস্থা পূর্ববর্তী বিশ্বাসকে আশ্রয় করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দাস ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য সাধারণ মানুষের সংগ্রামকে তদকালীন সংশ্লিষ্ট সুবিধা ভোগী শ্রেনী ঐশ্বারিক দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণ করতঃ তৌরত, ইঞ্জিল ও কোরাণ সৃষ্টি করে স্থিতি অবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্ত উক্ত ধর্মীয় গ্রন্থ সমূহ সাধারণ মানুষের সংগ্রামকে বাধাগ্রস্থ করতে পারেনি। আব্রাহামিক ধর্ম সমূহের সংশ্লিষ্ট সুবিধা ভোগী অংশ পূর্ববর্তী ধর্ম বা ধর্ম সমূহের সুবিধা ভোগী অংশ বা অংশ সমূহকে সৃষ্টিকর্তার বিধান থেকে বিচ্যুতির জন্য আবার দোষারোপও করতে থাকে। বর্তমানে কালের শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংগঠিত হওয়াকে বাধাগ্রস্থ করার লক্ষ্যে আধুনিক বুর্জোয়া পুজির সুবিধা ভোগী শ্রেনী, সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্বের শ্রেনীর লোভী অংশের মাধ্যমে বর্তমানে ধর্মকে ব্যবহার করে চলছে।

বাংলাদেশের ২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তীতে মুসলিম প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃক হিন্দু ধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘু হিন্দু নির্যাতন এবং ভারতের হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃক সেই দেশের গোধরা ও অযোধ্যায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘু মুসলান নির্যাতন সংশ্লিষ্ট দেশের শাসক গোষ্ঠির ভোট যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট। উল্লেখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের শাসক গোষ্ঠির প্রতিক্রিয়াশীল অংশ নিজ দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে প্রতিপক্ষকে জব্দ করার চেষ্টা করেছে।

উপরুক্ত বিশ্লেষণের পরিপেক্ষিতে আমার কাছে নারী দিবস পালনের কোন তৎপর্য বহন করেনি বিধায় বিষয়টির উপর লেখার তখন কোন তাগিদ বোধ করিনি। বর্তমান পুজিবাদী সম্যজ, সমাজে বসবাসরত মানুষ ও তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস বিশ্লেষণ করতে হবে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোন থেকে। বাংলাদেশের ৮০% মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। তারা ডারউইন বা কোয়ান্টাম অথবা যুক্তিবাদের মত কেতাবি তত্ত্ব বোঝে না। ঐ সকল তত্ত্ব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত্বের ড্রইং রুমের অলস আলোচনার বিষয়বস্তু, গণ ফোরাম নয়। ধর্ম বিশ্বাসী অশিক্ষিত ৮০% সাধারণ মানুষ সংগ্রাম করছে শোষণকারী, সমাজপতি ও মৌলবাদ এবং ধর্ম ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। এটাই হলো বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে যারা সাধারণ মানুষের সংগ্রামের সাথে একাত্মা প্রকাশ করে উক্ত সংগ্রামে যুক্ত হন তারাই বাস্তববাদী।

সবিনয় দৃষ্টি আকর্ষণ:

জনাব সাইফ উদ্দিন একজন উচু মানের লেখক ও জনাব দেওয়ান আবদুল বাসেত একজন নামকরা ছড়াকার এবং সাহিত্যিক। উভয়ই প্রগতিশীল ও মুক্তমনের উচুমানের ভদ্রজন। মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসে বাঙ্গালীদের গৌরব। প্রশাসনিক প্রয়োজনে আমরা সকলেই কোনাকোন জেলার অধিবাসী এবং বিশ্বাসে কোনাকোন ধর্মের অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু আমাদের ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত। তাই আমরা বাঙ্গালী। সাইফ উদ্দিন বা বাসেত সাহেব বিশেষ কোন জেলাকে প্রতিনিধিত্ব করেন না, তারা প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরব। তাই বিশেষ জেলার গৌরব হিসাবে তাদেরকে উপস্থাপন করা যথাযথ নয়।

সেতারা হাশেম ০৩/১১/০৫